মূলপাতা

# বঙ্গীয় সেক্যুলারিসমের ইসলামবিদ্বেষ

Asif Adnan

May 15, 2018

6 MIN READ

একটানা ফেইসবুক স্ক্রল করতে করতে মাঝেমাঝে এমন কিছু খবর পাওয়া যায় যা মনোযোগ কেড়ে নেয়। সম্ভবত এ আশাতেই মানুষ নিরন্তর যান্ত্রিক স্ক্রলিং চালিয়ে যায়। গত কয়েকদিনে এমন দুটো খবর চোখে পড়লো। প্রথম খবরটা প্রথম আলোর। শিরোনাম – "বৈবাহিক ধর্ষণ সম্পর্কেঅধিকাংশ নারীর ধারণা নেই"। দ্বিতীয় খবরটা ফেইসবুকের। কোটা সংস্কার আন্দোলনের একটি ছবিতে মাথায় টুপি ও মুখে দাড়ি থাকা কিছু মানুষের ছবি চিহ্নিত করে, একটি ছাত্র সংগঠনের পেইজ থেকে পোস্ট দেয়া হয়েছে – "এরা কাঁরা..? মেধাবীদের আন্দোলন এখন শিবিরের আন্দোলনে রুপ নিয়েছে।"

দু'টো খবরই বেশ ইন্টারেস্টিং। প্রথম খবরে আপাতদৃষ্টিতে এমন এক মহামারী "অপরাধের" কথা তুলে ধরা হচ্ছে, যা সম্পর্কে অপরাধী ও ভিকটিম কারোরই ধারণা নেই। যদিও আইনের দিক থেকে ইন্টেন্ট না থাকলে কোন কাজ আদৌ অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে কি না, সেটা নিয়েও অনেক বড় প্রশ্ন থাকে। যাক, নুআন্স এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামঞ্জস্য কখনোই বঙ্গীয় সেক্যুলারদের শক্তিশালী দিক ছিল না। তারা আবেগ আর আওড়ানোর ব্যবসা করে।

দ্বিতীয় খবরে, ইসলামের কিছু বাহ্যিক চিহ্নকে শিবিরের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে - এবং এর মাধ্যমে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে শিবিরের আন্দোলন বলা হচ্ছে। (অর্থাৎ কেবল শিবিরের সদস্যরাই দাড়ি রাখে, টুপি পরে। যেহেতু কোটা সংস্কার আন্দোলনে কিছু দাড়িটুপিওয়ালা লোক আছে, অতএব প্রমানিত হয় এ আন্দোলন শিবিরের।) তবে আরেকটু মনোযোগের সাথে তাকালে আপাত অর্থের পাশাপাশি এ দুটো খবরে সেক্যুলারদের দুটো মৌলিক প্রবণতার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

এক পাশ্চাত্য চিন্তার অন্ধ, মুখস্থ, কপি-পেইস্ট অনুকরণ।
দুই, ইসলামকে একটি বিরোধী শক্তি, একটি অশুভ শক্তি হিসেবে চিত্রায়ন। যারা সেক্যুলার নিজস্ব সংজ্ঞার "গ্রহণযোগ্য ইসলাম"- এর অনুসরণ করে না (যেমন, ঐসব লোক যারা দাড়ি রাখা বা টুপি পরার মতো "অপরাধ" করার স্পর্ধা দেখায়) তাদেরকে অপর/শত্রু হিসেবে চিত্রিত করা।

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের সেক্যুলাররা এ দু'টো কাজ করে আসছেন। যেমনটা বললাম, এ দু'টো বঙ্গীয় সেক্যুলারদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, তাদের সংজ্ঞার অংশ। কিন্তু এধরনের কাজের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল কী, এটা সম্ভবত তারা এবং তাদের বিরোধিরাও খুব কমক্ষেত্রেই অনুধাবন করতে পারেন।

অনেক সময় মানুষকে কোন আদর্শে দীক্ষিত করার চেয়ে কোন কিছুর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা সহজ। অনেক সময় "আমি কী বিশ্বাস করি", এঈ প্রশ্নের জবাব খোঁজার চাইতে, "আমি কীসের বিরোধিতা করি" – এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ। উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামবিদ্বেষের শাহবাগী মওসুমে সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর অবস্থানে আমরা এর উদাহরণ দেখেছি।

বাংলাদেশের বিনোদন জগত, সবচেয়ে প্রভাবশালী মিডিয়া, পত্রিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে সেক্যুলাররা। তুলনায় বিপরীত আদর্শের মানুষদের হাতে তেমন কোন প্রতিষ্ঠান বা মাউথপিস নেই বললেই চলে। যার অর্থ নিজেদের মতপ্রকাশ, প্রচার ও সমর্থনের বিভিন সুযোগ তারা পায়। নিঃসন্দেহে এধরনের প্রভাব তাদের হাতে অনেক ক্ষমতা এনে দিয়েছে। কিন্তু এ ক্ষমতা দুইধারী তলোয়ারের মত।

ক্রমাগত, সর্বত্র একই মুখ, একই বুলি, এবং একই চিন্তার পুনরাবৃত্তির কারণে সেক্যুলাররা জনগোষ্ঠীর ওপর নিজেদের প্রভাবকে ওভারএস্টিমেইট করে। সফট পাওয়ারকে তারা নিরেট ক্ষমতার সমতুল্য মনে করতে শুরু করে একধরণের

একোচেইম্বারে আবদ্ধ হয়ে আয়। তারা বুঝতে পারে না সাধারণ জনগণ আসলে কোন চোখে তাদের দেখে। তারা বোঝে না তারা কতোটা জনবিচ্ছিন্ন, কতোটা ঘৃণিত। কারণ তারা মনে করে নিজস্ব ছোট্ট ঘরে তারাই বাংলাদেশ। নিজেদের কথা ও কাজের নেতিবাচক ফলাফলের সঠিক মূল্যায়ন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে নিয়মিত তারা এমন সব কাজ করে যায়, এমন সব বুলি আওড়ে যায় যা তাদের জনবিচ্ছিন্নতা ও তাদের প্রতি প্রচন্ড নেতিবাচক মনোভাবকে আরো তীব্র থেকে তীব্রতর করতে থাকে।

নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে গত কয়েক দশকে সেক্যুলাররা কীভাবে কাজে লাগিয়েছে চিন্তা করে দেখুন। পাশ্চাত্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত বলিউডের মুখস্থ অনুকরণে নাটক, সিনেমা ও গানের মাধ্যমে নিয়মিত আমাদের সামনে এমনসব ধ্যানধারণা, আচারআচরন ও চিন্তা তুলে ধরা হয়েছে , যার সাথে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কোন ধরণের আলোচনা, পর্যালোচনা কিংবা বিশ্লেষন ছাড়াই পত্রিকা, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো শর্তহীন অন্ধ অনুসরণে, পশ্চিমা লিবারেল দর্শনের এমনসব চিন্তাকে স্বতসিদ্ধ হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যা মেনে নিতে মানুষ রাজি না (যেমন ৯০% নারী জানেন না তারা বৈবাহিক ধর্ষনের স্বীকার)। আর যারা, যখনই তাদের সাথে বিন্দুমাত্র দ্বিমত করছে, সেক্যুলাররা সাথেসাথেই তাদের "অপর" কিংবা "অচ্ছুৎ"-এ পরিণত করেছে। এভাবে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ক্রমেই কমেছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সমর্থন - ছোট হয়ে এসেছে তাদের নিজস্ব গন্ডি।

আবার দেখুন গত পাঁচ বছরে কীভাবে এ প্রভাবকে কাজে লাগানো হয়েছে। দাড়ি, টুপি ও বিশেষ করে হিজাব ও নিক্বাবের ওপর দশকের পর দশক ধরে চলে আসা আক্রমণ আরো তীব্র হয়েছে। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব ও নিক্বাব পরার কারণে ক্লাস ও পরীক্ষার হল থেকে ছাত্রীদের বের করে দেয়া হয়েছে। অনেককে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতেই দেয়া হয়নি। একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরণের ইসলামি পোষাকই নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন গুন্ডাবাহিনি দিয়ে "শায়েস্তা" করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে রীতিমতো গবেষনা করে হাই বা হ্যালো না বলে সালাম দেয়া, ইন শা আল্লাহ কিংবা আলহামদুলিল্লাহ বলা, গোড়ালির ওপর কাপড় থাকাকে উগ্রবাদ বলে প্রচার করা হচ্ছে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা, প্রচলিত হানাফি ফিকহের পরিবর্তেঅন্য কোন ফিকহ অনুসরণ করা এবং শিয়া ও সুফিদের প্রভাবে উপমহাদেশে ইসলামের নামে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নানা কুসংস্কার, ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও কাজকর্মের বিরোধিতা করাকে চরমপন্থা বা র‍্যাডিকাল বলা হচ্ছে।

শুধু ভিন্ন পোশাকের মতো আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ একটি বিষয়কে বহত্ববাদ ও সহনশীলতার গান শোনানো সেক্যুলাররা মেনে নিতে পারছে না। সবচেয়ে অসহনশীল, প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ দেখা যাচ্ছে, সারা জীবন এগুলোর বিরোধিতার দাবি করে আসা লোকদের মধ্যে। ইসলামের সাধারণ, একেবারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ের নিয়মনীতি মেনে চলাকেই, স্রোতের বিপরীতে চলাকেই মৌলবাদ, উগ্রতা, চরমপন্থা এবং এগুলোর "যৌক্তিক শেষ ধাপ" সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিপনা বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। আযান, হাজ্জ, কুরবানির মতো ইসলামের বিভিন্ন দিককে নানাভাবে আক্রমণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি ধার্মিক মুসলিমদের ব্যাকওয়ার্ড, বোকা, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দেখার প্রবণতা তো আছেই। "মুমিনরা চিন্তা করতে পারে না, বিজ্ঞান বুঝে না, দর্শন বুঝে না, আধুনিক সমাজ বুঝে না, শিল্প বা সাহিত্য বোঝে না, খালি বাচ্চা জন্ম দেয় আর মসজিদ-মাদ্রাসা করে –সবচেয়ে সফিস্টিকেইটেড বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবিদের কাছ থেকেও নিয়মিত এধরনের কথা শুনতে পাওয়া যায়।

ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে এই সেক্যুলার গোষ্ঠী - যাদের ইসলাম সম্পর্কেএকেবারে প্রাথমিক ধারনাও নেই, যারা নিজেরা ইসলামের প্রাথমিক বিধিবিধানগুলোও পালন করে না, বরং অনেক সময় এগুলো নিয়ে হাসিতামাশা করে - এই ১-২% লোক, তাদের কালচারাল ও পলিটিকাল প্রভাবের কারণে বাকি জনগোষ্ঠীর জন্য "গ্রহণযোগ্য" আর অগ্রহনযোগ্য ইসলামের সীমারেখা ঠিক করে দেবে। এবং যদিও প্রায় পাঁচ দশক ধরে একটি মাঝামাঝি মাত্রার সফল রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রশাসন এমনকি

সুসংজ্ঞায়িত পরিচয় গড়ে তুলতেও তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে কোন ধরণের আদর্শ ও নৈতিক কাঠামো দিতে ব্যর্থ হয়েছে - তবুও তাদের কাছ থেকেই অন্যদের সফলতা, আধুনিকতা, নৈতিকতা ও সামাজিকতা শিখতে হবে। এধরনের মনোভাব চরম মাত্রা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং প্রচন্ড বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম দেয়। আর এভাবে জন্ম হয় গভীরভাবে দ্বিখণ্ডিত একটি দেশের।

নিজেদের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করেছে সেক্যুলাররা নিজেরাই। একটা সময় পর্যন্ত সেক্যুলারদের বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা ও দেওলিয়াত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ ও ঘৃণা সীমাবদ্ধ ছিল তাদের আদর্শিক প্রতিপক্ষদের মধ্যে। যাদেরকে সেক্যুলাররা মৌলবাদি বা ইসলামপন্থি বলে। ঐতিহাসিকভাবে আদর্শের চেয়ে সুবিধা, পেটের দায় ও নগদ প্রাপ্তিই এ ভূখন্ডের মানুষকে বেশি প্রভাবিত করেছে। তাই ব্যাপারটা এ পর্যায়ে থাকলে, হয়তো সেক্যুলাররা আরো দীর্ঘদিন নিজেদের শ্বেত প্রাসাদে আত্মম্ভরিতার সাথে “সাহিত্য আর প্রগতি করে” কাঁটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু কোটা সংস্কার আন্দোলনের মতো একেবারেই ছাপোষা ও প্রায় সর্বজনীন একটি আন্দোলনকে শিবিরের আন্দোলন আর ইসলামের একেবারে প্রাইমারি কিছু রীতিনীতির অনুসরণকে উগ্রবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে তারা নিজেরাই সেক্যুলারবিরোধিতা-র মেইনস্ট্রিমিং করে দিয়েছে।

আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মম্ভরিতা খুব কম সময়ই ইতিবাচক ফলাফল আনে। বাংলাদেশের সেক্যুলাররা আত্মমুগ্ধতার এক দুষ্ট চক্রে আটকা পড়ে গেছে। একদিকে নিজেদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ঔদ্ধত্যের সাথে বাকিদের লেকচার দিচ্ছে, ভুল ধরছে, সব বিরোধিদের জামাত-শিবির-জঙ্গি-রাজাকার-সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করছে। আর এভাবে ক্রমেই আরো বেশি মানুষকে নিজেদের বিরুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে। আর যতোই বিরোধিতা বাড়ছে, ততোই বাড়ছে তাদের ঔদ্ধত্য, শ্লেষ ও ফলাফল হিসেবে বিচ্ছিন্নতা।